আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাণী

(বাণীর ঐশতাত্ত্বিক ও জীবন ভিত্তিক গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা)

– ফা: যাকোব এস. বিশ্বাস

"আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাণী" – এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন জাগে "আমরা ঈশ্বরের বাণী কোথায় পাব ?" । পবিত্র বাইবেলই স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী, যাতে মানুষের প্রতি যত্ন ও ভালবাসা প্রকাশিত। তাই বাইবেলের মধ্য দিয়ে আমরা স্নেহশীল পিতা, জগত্রাতা পুত্র ও সন্তানদাতা পবিত্র আত্মা রূপে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় পাই এবং স্রষ্টা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানুষ হিসাবে আমাদের নিজেদেরও প্রকৃত পরিচয় পাই। এ বাস্তবিকই বিস্ময়কর !

কিন্তু এর চেয়ে বিস্ময়কর, এমন কি বাইবেলে বর্ণিত আশ্চর্য মহাকীর্তিরও চেয়ে অধিক বিস্ময়কর হল যে, স্বয়ং পিতা আপন ঐশবাণী দ্বারা পবিত্র আত্মার প্রেরণাপূর্ণ এই লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেন। আমাদের জীবনের গভীর নিস্তব্ধতায় (প্রজ্ঞা ১৮:১৪) প্রতিদিন আদি লগ্নের সেই সনাতন বাণী ধ্বনিত হয় : 'আলো হোক!' এবং ঐশবাণীর এই আহ্বানে আমরা ঐশ আলোর মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট হই; আর আমরা জীবন পাই, যেহেতু ঈশ্বরের বাণীই আমাদের জীবন (দ্বি: বি: ২১:৪৭)। যদি বিশ্বাস ও বাধ্যতার সঙ্গে সেই বাণী মেনে চলি, তবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে পিতা ও পুত্র আমাদের কাছে আসবেন ও আমাদের মাঝে গড়বেন তাঁদের নিজেদের বাসস্থান (যোহন ১৪:২৩)। সাধু আথানাসিউসের ধারণা অনুসারে বাইবেল-পাঠক ঈশ্বর-বাহক হয়ে ওঠে ! ঈশ্বরের বাণী কিভাবে আমাদের জীবনে আসেন বা আমাদের জীবন মাঝে বাস করেন তারই সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

"আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাণী" অথবা অন্য কথায় বলা যায়, "বাণীর মানব দেহ ধারণ ও আমাদের মাঝে তাঁর আবাস" – এ শিরোনামটিই বলে দেয়, এই লিখিত প্রয়াসটির মধ্যে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত দুটো মূলভাব আছে ঃ বাণীর মানব দেহ ধারণ ও পৃথিবীতে বাণীর আবাস বা আমাদের জীবনে/জীবন মাঝে ঈশ্বরের বাস। এই দুটো মূলভাব থেকেই বেরিয়ে আসবে বাণীর দেহধারিত ঐশতত্ত্বের অনেক আহ্বান।

ক) বাণীর মানব দেহধারণ ঃ

বাণী তো মানুষের মুখের কথা; আবার মানুষের মনের কথাও। মানুষ যা চিন্তা করে, অনুভব করে, ধ্যান করে, পরিকল্পনা করে তা-ই সে নিজের ভাষায় প্রকাশ করে। ভাষা ও তার প্রকাশ কৌশল যত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়, মনের অভ্যন্তরের সেই কথা, সেই চিন্তা, সেই পরিকল্পনা ততই বোধগম্যরূপে প্রকাশিত হয়। অনেক মানুষ তার ভিতরের কথাকে যখন-তখন বা যেমন-তেমন ভাবে প্রকাশ করে না; সে জানে কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ করতে হবে তার মনের ভাব। 'চিন্তা, অনুভব, ধ্যান ও পরিকল্পনা' বাণী বা কথার এই মানবীয় বাস্তবতা আমাদের প্রত্যেকের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যে আছে বৈকি! আর এই সহজ-সরল, সাধারণ ও বাস্তব সত্যটি সামনে রেখেই আমরা 'অতি-প্রাকৃতিক' বাস্তবতার শাস্ত্রের আলোকে বাণী ও বাণীর দেহধারণ রহস্য পর্যালোচনা ও অনুধ্যান করার সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারি। তবে বলে রাখা ভাল যে, রহস্য তা-তো সম্পূর্ণ ঐশ-নিয়ন্ত্রণে। মানব অন্তর তা নিয়ে শুধু ধ্যান করতে পারে, এক-আধটু পর্যালোচনা করতে পারে।

সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে **'বাণী'** শব্দটির ব্যবহার করতে গিয়ে গ্রীক শব্দ 'লগস' ব্যবহার করেছেন। মঙ্গলসমাচার লিখতে গিয়ে সাধু যোহন এই বাণীকে স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁর অদৃশ্য/অপ্রকাশিত অস্তিত্বকে বুঝাতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের শুরু বা শেষ নেই, তিনি অনাদি-অনন্ত। যা-কিছু সৃষ্ট তা-তো এই বাণীরই দ্বারাই। তাই মজার একটা ব্যাপার দেখি যে, আদি পুস্তকটি যে

শব্দ 'বেরেশিৎ' অর্থ 'আদিতে' দিয়ে শুরু হয়েছে সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারও একই শব্দ 'এ্যান আরখে' অর্থ 'আদিতে' দিয়ে শুরু হয়েছে।

হিব্রু শব্দ 'বেরেশিৎ' অর্থ 'আদিতে' দিয়ে শুরু হয় – এই সত্য বুঝাতে যে, ঈশ্বরের বাণী হলো সৃজনশীল বাণী। হিব্রু 'দাবার' ঈশ্বরের বাণীই হলো শক্তি এবং সৃজনশীল। তিনি বলেন আর সমস্ত অস্তিত্ব লাভ করে। তাই ঈশ্বরের এই বাণীর উপর সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য নির্ভর করে ও সমস্তই সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রীক শব্দ 'এ্যান আরখে' অর্থ 'আদিতে' সাধু যোহনের জন্য এই অর্থ যে, যীশুর প্রকাশ্য জীবন ঈশ্বরেরই আত্মপ্রকাশের একটি প্রত্যক্ষ মাধ্যম এবং ঈশ্বরের চিরন্তন বাণীর মধ্যেই এই আত্মপ্রকাশ গৃহিত।

১। সাধু যোহনের আগে গ্রীক দর্শন এই 'লগস' শব্দটি ব্যবহার করেছে যুক্তি এবং মুখের কথা অর্থাৎ ***অন্তরের চিন্তা, পরিকল্পনা*** ইত্যাদি এবং এর বহিঃপ্রকাশ বুঝাতে। সাধু যোহনের এই শব্দ ও অর্থ মঙ্গলসমাচারে যীশুর মধ্যে ব্যবহার করে বুঝাতে চেয়েছেন যীশুর মানব দেহধারণ, তার গোটা প্রকাশ্য জীবন, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান হচ্ছে মানুষের নিকট ঈশ্বরের বহুদিনের, বহুকালের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার প্রকাশ-এর বাস্তবায়ন। অতএব ঈশ্বরের বাণী তথা দেহধারিত যীশু শুধু একটি ইতিহাস নয়, এ হলো বাণীর এই ঐশ রহস্যের তাৎপর্যের একটি বাহক। যীশুর দ্বারা ও যীশুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের নিজেকে মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বোধগম্য করলেন। তাই তো যীশু নিজেকে বলেছেন "তাঁর বাণী হল 'আত্মা'।" তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো স্বয়ং ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ।

২। ***বাণীর মানব দেহধারণ ঃ*** মানুষ হওয়া বা মাংস হওয়া; মানুষ/ মাংস যখনই বলি, যীশুর কথা ও কাজ সেই 'লগস' এরই ক্রিয়াশীলতা/কার্যকারিতা, ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, তখন বুঝতেই হয় যে, এই 'লগস' দেহধারণ করেছে অর্থাৎ মানব পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে, বাণী রক্তমাংসের মানুষ হয়েছে। পাপ ব্যতীত পুরোপুরিই বাণী মানুষ হয়েছে। যোহন ১:১৪ পদে উল্লিখিত মূল রচনায় গ্রীক 'সার্কস' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ আসলে 'মাংস'। মজার বিষয় হল, গ্রীক শব্দ 'আনের' (ব্যক্তি) বা 'এ্যন্ত্রপস' (মানুষ) ব্যবহার না করে ব্যবহার করলেন 'সার্কস' (মাংস) শব্দটির আগে আবার কোন 'টা' বা 'টি' অর্থাৎ article ব্যবহার করেননি এই বুঝাতে যে, এই বাণী 'হলেন' become পুরোপুরি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ।

হওয়া : মানুষ হওয়া বুঝাতে যোহন তার মঙ্গলসমাচারে ব্যবহার করলেন গ্রীক 'এগেনেতো' যার অর্থ 'হইলেন'; ব্যবহার করেননি ক্রিয়া পদ 'হয়' কিন্তু ব্যবহার করলেন ক্রিয়া পদ 'হওয়া'। বাণী প্রকৃত অর্থেই পুরোপুরি মানুষ হলেন। এখানে ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে প্রসঙ্গ টানতে পারি " "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন (ফিলি: ২:৭) তবে সাবধান ! এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করলেন, কেননা ঈশ্বরত্বের চির অধিকারী তিনি। ব্যক্তি হিসেবে সেই পরম বাণী পিতা থেকে স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তিনি ও পিতা এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর পুত্র যে একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, এই তত্ত্ব খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের একটি মূল কথা। পদটি বলতে চায়, ঈশ্বরত্ব নিয়েই তিনি প্রকৃত মানুষ হলেন। অতএব বলা যায়, বাণীর মানবীয় অস্তিত্ব শুরু হলো নাজারেথের যীশুর মধ্য দিয়েই। এই 'হওয়া'-এর মধ্য দিয়ে মানুষের পরিত্রাণ। সাধু যোহনের এই মঙ্গলসমাচারকেই বলা যেতে পারে দেহধারণসূচক ঐশতত্ত্ব।

৩। ***বাণীর আবাস :*** 'বাস করলেন' বুঝাতে সাধু যোহন ব্যবহার করলেন গ্রীক শব্দ 'এস্কেনেইসেন'। এই ক্রিয়া শব্দটির মূল বিশেষ্য হল 'সেকিনা' অর্থ 'তাঁবু'। পুরাতন নিয়মে তাঁবুতে ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপস্থিতি। তাঁবুর মধ্যে থাকত বিধান। তাঁবুর উপস্থিতি ছিল ইস্রায়েল জাতির মাঝে সদাপ্রভুর উপস্থিতি (যাত্রা ২৯:৪২-৪৩; ৩৩:৭-৯)। মনে করি, এই একই ভাবধারা যোহন ব্যবহার করতে চেয়েছেন যে, দেহধারিত এই বাণী মানুষের মাঝে বাস্তবেই উপস্থিত তথা তিনি এইভাবেই মানুষের মাঝে

তাঁবু খাটালেন বা বাস করলেন। এখন ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য কোন সিন্দুক (তাঁবু)-এর প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই কোন জেরুশালেম মন্দির। ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর উপাসনা এখন যীশু যিনি ঈশ্বরের পরম বাণী।

৪। ***বাণীর মহিমা প্রত্যক্ষ মহিমা*** : গ্রীক মূল পাণ্ডুলিপিতে 'দক্সা' অর্থ 'ওজন বা মহিমা' এই বাণীর মানুষ হওয়া, তাঁর প্রকাশ্য মহিমার প্রকাশ। তাঁর আগমন পাপের অন্ধকার দূর করেছে; গোটা পৃথিবী আলোক উজ্জ্বল হয়েছে। যীশুর রূপান্তর ঘটনা এবং আরো কত কাহিনী যীশুর এই মহিমালোক প্রকাশ করেছে। তবে যীশুর মহিমা সবচেয়ে উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে।

খ) বাণীর জীবন ভিত্তিক গুরুত্ব

এতক্ষণ ধরে বাণীর ঐশতত্ত্বে বা শাস্ত্রীয় পর্যালোচনায় ছিলাম। পবিত্র শাস্ত্র/ বাণী এমন যে, এর গভীরতা শেষ করা যায়-ই না। শুধু ইতিহাস নয় বরং নিজ চলমান এই বাণীর মানব দেহধারণ রহস্য পর্যালোচনা ও ধ্যান-অনুধ্যান। এবার জীবন-বাস্তবতায় দেখি –

আমাদের জীবনে আমরা তিনভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনে থাকি :

প্রথমত, এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাণী শুনেন কিন্তু তার চেয়ে আর বেশী কিছু করেন না (কান দিয়ে শুনা)।

দ্বিতীয়ত, আরেক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যারা ঈশ্বরের বাণী শুনেন এবং ঈশ্বরের বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন (মন দিয়ে শুনা)।

তৃতীয়ত, আরেক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আছেন, যারা অতি আগ্রহের সাথে ঈশ্বরের বাণী শুনেন, বাণী ধ্যান ক'রে এর অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন এবং সেই বাণীর আবেদন অনুসারে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ বাণী অনুসারে জীবনযাপন করেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা বা সাধনা করেন। (হৃদয়-মন দিয়ে শুনা ও বাণীময় হয়ে উঠা)।

সাধু পলের ভাষায়, খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করব শুধু তখনই, যখন খ্রীষ্টের চিন্তাধারা হবে আমাদের চিন্তাধারা, খ্রীষ্টের কথাবার্তা হবে আমাদের কথাবার্তা, খ্রীষ্টের কার্যকলাপ হবে আমাদের কার্যকলাপ, খ্রীষ্টের জীবন হবে আমাদের জীবন। তখনই শুধু সাধু পলের মতো বলতে পারবো, "এখন হতে আমি আর আমি নই, খ্রীষ্টই আমাতে, আমি খ্রীষ্টেতে"।

মিলনের আধ্যাত্মিকতা : বাণীর দেহধারণ করে ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা ও ক্ষমার ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। বিনম্রতায় মানুষের স্বরূপ নিলেন; মানুষের মাঝে তাঁর আবাস গড়তেই এমনটি করলেন। বাণীর এই দেহধারণ আহ্বান জানায় আমাদের মধ্যে এই প্রেম, ক্ষমা, শান্তি ও মিলনের বাস্তবায়ন করতে। যেখানে এই মূল্যবোধগুলোর বাস্তবায়ন, সেখানেই তো 'বাণীর দেহধারণ'; সেখানেই তো দেহধারিত বাণীর আবাসন বা ঈশ্বরের বাণীর আবাস। যে বাণী/ঈশ্বরের বাণী আমাদের মধ্যে সেই বাণীই / যীশুই আপনার ও আমার জীবনে আহ্বান করেন আমরা যেন যা আমাদের

মধ্যে লুকোচুরি খেলছে অহম, নিছক, কৃত্রিমতা, শুধুই দেখানো/লোক দেখানো; আবার এ-ও হতে পারে যে, বাইরে সবই সুন্দর ভিতরে থাকতে পারে পারিবারিক কোন্দল, শাশুড়ী-ছেলে-বৌ এর মনোমালিন্য, ভাইয়ে-ভাইয়ে গোস্‌সা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, প্রতিবেশীর সাথে দীর্ঘ দিনের অমিমাংসিত কোন্দল এবং আরো অনেক কিছু। এগুলি সমূলে ধ্বংস করার শক্তি তো আমরা/আমি পাই ঈশ্বরের বাণী/যীশুর দেহধারণ থেকেই। সর্বশক্তিমানতা থেকে নেমে এলেন ধরায় মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে, ঈশ্বর-মানুষে এবং মানুষে মানুষে মিলন ঘটাতে, স্বর্গের পথ, শান্তি ও মানুষের মিলন প্রদর্শন করতে। ঈশ্বর যদি এমনটিই হতে পারলেন আমরা কি পারব না ঈশ্বরের বাণীর/যীশুর এই অমূল্য মূল্যবোধকে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে ? অবশ্যই পারব বৈকি ! যেখানে বাস্তবায়ন, সেখানেই ঈশ্বরের বাণীর পূর্ণতা।

উপসংহার ঃ অতএব, প্রবন্ধটির প্রথম অংশটি ভীষণভাবে ঐশতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রভিত্তিক হলেও তা আমরা যদি সত্যিকারভাবে ধ্যান-অনুধ্যানে নিয়ে আসি তবেই এর চ্যালেঞ্জযুক্ত দাবীগুলোর জোর তাগিদ আমরা অনুভব করব। শুধু অনুভব করেই ক্ষান্ত হবো না; এর তাগিদই আমাদের নিয়ে যাবে শান্তি ও পুনর্মিলন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, সকল বৈষম্য পরিহার, অহমের পরিবর্তে নম্রতা ও প্রতিবেশী প্রেম এমন সব মূল্যবোধের বাস্তবায়নের দিকে। এই মিলন দেখে অবাক হবে সবাই। আনন্দিত হবে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা, আনন্দিত হবে হিন্দু-মুসলমানেরাও। ঈশ্বরের বাণীর মধ্য দিয়ে তথা যীশুর মধ্য দিয়ে আমরাও এভাবে নবজন্ম নিয়ে তাঁর আবাসকে প্রকৃতভাবেই আমাদের (ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ) জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারি। রোমীয়দের কাছে সাধু পৌল তাঁর পত্রে বলেন, "ঐশবাণী তোমার কাছেই, তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরে রয়েছে (১০:৮)।

তাই আসুন, পবিত্র বাইবেলের শেষের বাণীর সঙ্গে (প্রত্যা ২২:২০) আমরাও ভক্তির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলি, 'প্রভু যীশু, মারানাথা ! এসো, প্রভু যীশু, আমাদের হৃদয়ে তোমার বাণী ধ্বনিত করতে প্রতিদিন আমাদের কাছে এসো, যেন নিশিদিন তোমার বাণী জপ্‌ করতে (সাম ১:২) ও সর্বত্র তোমার বাণী প্রচার করতে (মার্ক ১৬:২০) মর্তে প্রবাসী আমরা সেই স্বর্গেরই জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠি, যেখানে পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে তুমি যুগে যুগে বিরাজমান'।

বক্তব্যের উপর মুক্ত আলোচনা

বাণী ব্যর্থ হয় না। যেহেতু আমাদের জীবনে আমরা বাণীকে গুরুত্ব দিই না বা বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি না, সেইজন্য আমাদের জীবনে বাণী ফলপ্রসূ হয় না।

কুমারী মারীয়া বাণীর দেহধারণের পূর্ণতা দেন। সাধু-সাধ্বীগণ নিজেরা বাণী অনুসারে জীবন যাপন করে বাণীময় হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের দেখতে হবে, কীভাবে আমরা বাণী হয়ে উঠতে পারি। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাণী এবং নাজারেথের যীশুর মধ্যে বাণীর দেহধারণ ও পূর্ণতা —এ বিষয়ে আমাদের আরও জানতে হবে। যেখানে ঈশ্বরের বাণী এখনও পৌঁছায়নি, সেখানে কীভাবে পৌঁছানো যায়, তার পথ অনুসন্ধান করতে হবে। বাণী প্রচারের যে বাধা আসে, তা ভাল কারণ আমরা কিছু কাজ করছি। বাধার চিন্তা আমাদের করতে হবে না। আমরা চেষ্টা করব, ফল দেবেন ঈশ্বর। হতাশ হব না, বিশ্বাসভরা অন্তর নিয়ে অপেক্ষা করব। আমাদের অধিক বিশ্বাস দরকার। বাণী নিজের কাছে ও অন্যের কাছে যায় আমাদের বিশ্বাস অনুসারে। যখন আমরা ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবনে ধারণ করি, তখনই তা আমরা অন্যকে দিতে পারি।

ঐশবাণী প্রচার : গুরুত্ব, ক্ষেত্র, উপায় বা পদ্ধতি

পটভূমি ও পূর্বকথা

ক) এবার বিশপগণের যে সীনড হতে যাচ্ছে, তার শাস্ত্রীয় শিরোনাম হলো : Word of God and Mission of the Church

খ) ২০০৮ জুনের ২৯ তারিখ থেকে ২০০৯ জুনের ২৯ – এই একটি বছরকে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সাধু পলের বছর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইতিমধ্যে প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশে যথাযথ ভাবে বছরটি পালন করার জন্য বিশপগণের কাছে পত্রও পাঠিয়েছেন।

গ) মাত্র গত বছর মে মাসে থাইল্যাণ্ডের চেনমাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Asian Congress, যার মূলসুর ছিল : Telling the Story of Jesus অর্থাৎ এশিয়াতে যীশুর গল্প বলা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন তদ্রূপ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য ৫টা ধর্মপ্রদেশ থেকেই পি এম এস-এর ব্যবস্থাপনায় ও নীতিনির্ধারণে প্রতিনিধি গিয়েছিল।

ঘ) ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বাস ও কৃষ্টির সংলাপ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর গল্প বলা। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কর্মশালার মূলভাব : যীশুর গল্প বলা। খুলনা ধর্মপ্রদেশেও অনুরূপ ভাব বেছে নেওয়া হল : ঐশবাণী ও ঐশবাণী প্রচার। এ যেন মঙ্গলবাণী প্রচারের আধুনিকীকরণ ও আন্দোলন।

প্রথম ভাগ : ঐশবাণী প্রচার

(পবিত্র বাইবেলকে ভিত্তি করে শিরোনামটির অনুধাবন)

১। ঐশবাণী প্রচার। এ কথাটির মধ্য থেকে আসে ঈশ্বর ⇔ কথা ⇔ প্রচার –এই তিনটি বিষয়।

(ক) পুরাতন নিয়ম : ইতিহাসে ঈশ্বরের প্রকাশ ও প্রচার (হিব্রু শব্দ : দাবার; দিব্বের)

– এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? পরিস্থিতি কেমন ছিল ?

– ঈশ্বর প্রচার ও প্রকাশ করেছেন – ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির কাছে।

পদ্ধতি বা উপায় ঃ ব্যক্তি, ঘটনা, ক্ষেত্র।

ইস্রায়েল জাতি এবং বহু ঈশ্বরবাদী আরো অনেক শক্তিশালী সভ্যতা।

- প্রবক্তা সাহিত্যে বাণী ও প্রচার ঃ

প্রবক্তা বাণী গ্রহণ করেন। প্রবক্তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর বাণী ঘোষণা করেন। প্রবক্তা বাণী গ্রহণ করেন তা সম্প্রচার করার জন্য। তাই বাণী গ্রহণ ও প্রচার একটি প্রাবক্তিক ক্রিয়া।

(খ) কথা/বাণী : নতুন নিয়ম - যীশু ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ। (গ্রীক শব্দ : লগছ্)

মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ যেভাবে লেখনীর মধ্য দিয়ে যীশুকে তুলে ধরেছেন –

- ক্ষেত্র, শ্রোতা, পরিস্থিতি অনুসারে ব্যক্ত করেছেন। তুলে ধরেছেন যীশুর জীবন।

যীশুর আমলে বাস্তবতা :

- ইহুদীরা বড়, বিজাতীয়রা ছোট;
- ফরিশী, শাস্ত্রীদের অনেক ভণ্ডামী; কৌশলে দরিদ্রদের আরো দরিদ্র করে তোলে।
- কাঠামোগতভাবেই শ্রেণীভেদ : যারা ইহুদী তারা সামনের বেঞ্চের লোক;
- যারা বিজাতীয় তাদের ঘরে যাওয়া নিষেধ, তারা ছোট জাত;
- মহিলারা ভাগ্যহতা, তারা নীচু শ্রেণীর;
- অসুস্থ, কুষ্ঠরোগীদের সীমাহীন দুর্ভোগ→ সমাজচ্যুত, ঈশ্বরের অভিশাপ, যাজকদের ভণ্ডামী।
- নিয়মের প্রতি কড়াকড়ি।
- সামাজিক অন্যায্যতা, ভাল কাজকে অপব্যাখ্যা।

এমন অবস্থায় যীশু তাঁর জীবন ও কাজ, শিক্ষা ও শিষ্যদল নিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার করেন।

বাণী প্রচারের উপায় বা পদ্ধতি

যীশু একজন গল্প-কথক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রিয় পদ্ধতি ছিল উপমা, যা ঐশরাজ্যের নিগূঢ় রহস্য উঘাটন করত। যীশুর উপমাগুলো ঈশ্বরের সাথে ও ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। যীশু এশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন – বিশেষ সমাজ, বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাঝে; বলা যায়, অস্বস্তিকর কতকগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ধর্মীয় গোড়ামির মাঝে। এরই মাঝে যীশু তখনকার লোকদের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয় পরিত্রাণের বিষয় গল্প বলেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন একজন পাকা শিক্ষাগুরু হিসাবে। আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করি যে, যীশু হলেন, সেই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ – পুত্র, যিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন, ঈশ্বরকে তথা মানুষের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমার প্রেমকে প্রকাশ করেছেন : শিক্ষা দিয়ে, জীবনদৃষ্টান্ত দিয়ে, শেষে জীবন উৎসর্গ করে। বলতে পারি, যীশু হলেন ঈশ্বরের দেহধারিত (প্রত্যক্ষ) প্রেমকাহিনী।

শিষ্যদল

❑ *অভিজ্ঞতা ....*

যীশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যেরা বলে উঠেছিল : 'আমি প্রভুকে দেখেছি!'; 'ইনি প্রভু!' ; 'এ কথা সত্য যে, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন!'; 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার !' তারা আনন্দ করেছিল : তাদের প্রভু জীবিত ! শত দুঃখ-কষ্ট... পরিণত হল বিশ্বাস ও আনন্দে।

যীশু ব্যক্তিগতভাবে তার অনুসারীদের কাছে আসেন, তাদের নাম ধরে ডাকেন : মারীয়া মা ালা, পিতর, জেমস্, যোহন... তারা তাকে চিনতে পেরেছিল, বিশ্বাস করেছিল। তথাপি তিনি তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন : *"তোমরা সমগ্র জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (মার্ক ১৬:১৫); " যাও, তোমরা গিয়ে জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর" (মথি ২৮:১৯); "তোমরাই এই সবকিছুর সাক্ষী রইলে"; "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত ক'রে তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২১:২১)*। আর যীশুর শিষ্যেরা বেরিয়ে পড়ে যীশুর বিষয় (Jesus story) বলার জন্য, প্রচার (proclaim) করার জন্য। তারা যায় কাছে বা দূরে, বিভিন্ন জায়গায় : জেমস জেরুসালেমে, পিতর ও পল রোমে, টমাস ভারত পর্যন্ত। আসলেই, পুনরুত্থিত যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ অর্থই প্রচারের জন্য প্রেরিত হওয়া।

❑ ***পদ্ধতি ...***

তারা প্রচার করেছিল :

(ক) মৌখিক প্রচার দ্বারা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রচার একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় : খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার চ্যালেঞ্জ। বাস্তব সমস্যা, বিজাতীয়দের কি মানদণ্ডে গ্রহণ করা হবে। সাধু পল প্রচার করেছেন নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। তিনবার সাধু পলের মন

"পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত ক'রে তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২১:২১

"সঙ্গে তোমরা টাকার থলি, বা ঝুলি, বা জুতো নিয়ো না" (লুক ১০:৪)।

পরিবর্তন উল্লেখ করা আছে – (শিষ্যচরিত ৯,২২,২৬। সাধু পল তার লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন। সাধু পল ব্যতিক্রমধর্মী খ্রীষ্টপ্রচারক; বিজাতীয়দের মাঝে প্রচারের জন্য মনোনীত : তাঁর কথা ও জীবন প্রচার করে।

(খ) শিষ্যেরা প্রচার করেছেন উপাসনা-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে, (শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)।

(গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে (ডিকন, প্রবীণ, পালক ইত্যাদি)।

(ঘ) প্রচার করেছেন তাদের জীবন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে।

❑ *ক্ষেত্র ...*

ইহুদী অধ্যুষিত এলাকা, অনিহুদী এলাকা, নিকট ও দূরবর্তী। অনেকে গ্রহণ করেছে, অনেকে গ্রহণ করে নাই। যারা খ্রীষ্টান হয়েছে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে ধরে রাখার জন্য (লেখনী, পত্রাদি); পালকদের কাছে ব্যক্তিগত পত্র কতকগুলো দিক নির্দেশনা ও মূল্যবোধ তুলে ধরার জন্য। উপাসনালয়ে, বিভিন্ন লোকালয়ে, অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে।

(১) পোপ ২য় জনপল বলেছেন : এশিয়াতে মণ্ডলী। এখানে বিভিন্ন কৃষ্টির ধারায় যীশু গল্প বলা যাবে। মিশন অর্থ যীশুর বিষয় গল্প বলা জীবিত রাখা, সমাজ গঠন করা, সমবেদনা প্রকাশ, অন্যদের বন্ধু করা, ক্রুশ বহন করা একত্রে, এভাবে যীশুর সাক্ষ্যদান।

(২) থাইল্যাণ্ড ঃ এশিয়ান মিশন কংগ্রেস । এশিয়ায় যীশুর গল্প-কাহিনী বলা। কংগ্রেস-এর আহ্বান : নতুন ধারার মণ্ডলী-মিলন সমাজ। এশীয় মিশন কংগ্রেস : ঐশবাণী ঘোষণা করার অনন্য পদ্ধতি। যীশুর বিষয়ে গল্প বলা বা গল্পের মাধ্যমে যীশুকে প্রচার – ধর্মশিক্ষা।

কংগ্রেস : এখানে ছিল বিশ্বাসের সহভাগিতা। বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি থেকে। যেন এম্মাউস কাহিনী : অন্তরে আগুন জ্বলছে। এই কংগ্রেস এনেছে নতুন ধ্যান-ধারণা আমাদের কাজে : দরিদ্রের সাথে, অন্য ধর্মগুলোর সাথে, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা ও সংলাপ। বাণী প্রচারের আনন্দ পুনরায় আবিষ্কার। নতুন উদ্দীপনা যীশুকে প্রচার করার। উপমা, গল্প, প্রতীক, সংস্কৃত্যায়ন ও সংলাপ। বাণী প্রচারের আনন্দ পুনরায় আবিষ্কার। নতুন উদ্দীপনা যীশুকে প্রচার করার। উপমা, গল্প, প্রতীক, সংস্কৃত্যায়ন দ্বারা যীশুর বিষয় বলা, সংলাপ করা, বিশ্বাসের সহভাগিতা।

অতএব মিশনারী কাজে অগ্রাধিকারগুলো –

ক) আমাদের ব্যক্তি জীবনে ঈশ্বরের বাণী : যীশুর বাণী গভীরভাবে ধ্যান; ব্যক্তি জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যীশুর গল্প অভিজ্ঞতা

খ) অন্যান্য ধর্মের লোকদের মধ্যে যীশুর গল্প : অন্য ধর্ম সম্বন্ধে জানা; ইতিবাচক মনোভাব, ভুল বুঝাবুঝি দূর

গ) কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে যীশুর গল্প : সেবার কৃষ্টি, ধ্যান, সরল-সহজ জীবনের কৃষ্টি, মিলনের কৃষ্টি; স্থানীয় উৎসব, চিত্র, প্রতীক, সঙ্গীত ... ধর্মশিক্ষাদান পদ্ধতিতে সংস্কৃত্যায়ন।

বাংলাদেশ

জাভেরিয়ান ও পিমে আয়োজিত সেমিনার :

বিশ্বাস ও কৃষ্টি – কাথলিক হওয়ার নতুন ধারা : বিভিন্নতায় একতা/ঐক্য

বিশ্বায়ন -এর মত বিভিন্ন প্রভাব : নতুন নতুন আন্দোলন : ক্যারিসম্যাটিক... এগুলোর মুখোমুখি হবে কেমন করে ? বিভিন্ন প্রভাব, গণমাধ্যম বা মিডিয়া, ইন্টারনেট ... এরই মাঝে কিভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণা; বাইবেল পাঠ ও সহভাগিতা; ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ; একসঙ্গে পরিচালনা ও নেতৃত্ব... কিভাবে ?

তার জোর দেওয়া হচ্ছে : মৌলিক খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন; কৃষ্টির মধ্যেই শিকড়; বিশ্বাসের ঐতিহ্যের প্রতি উন্মুক্ততা; দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে একাত্মতা।

তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ :

- আধ্যাত্মিক : ঈশ্বরকে কি অভিজ্ঞতা করা যায় জীবন-বাস্তবতায় ? বাইবেল পাঠ যুগ লক্ষণ ধরে; ঐশবাণী হৃদয়ঙ্গম করা জীবনে
- সামাজিক : হৃদ্যতা, পারস্পরিক সহভাগিতা, সমর্থন
- অর্থনৈতিক : একসঙ্গে সমস্যা সমাধান, ক্রেডিট ইউনিয়ন

জগত গল্পে পরিপূর্ণ। মানব জীবন গল্প ছাড়া চিন্তা করা যায় না। গল্প বলে দেয় আমরা কে, এবং অপরের সঙ্গে তথা লোক, কৃষ্টি, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে দেয়। এগুলোর মধ্য দিয়েই তো আমাদের জীবনের গভীরতম সত্তার বিস্ফরণ ঘটে। আর এই গল্পগুলো আমাদের জীবন ও আমাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। এগুলো চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে রূপান্তরিত করে। সমাজ (community) গঠন করে দেয় এই গল্পগুলো।

আজকে আমরা গোটা খুলনা ধর্মপ্রদেশ থেকে এখানে সমবেত হয়েছি এই পালকীয় সম্মিলনীতে ঐশবাণী ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে; ক্ষেত্র হিসাবে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতা নিরূপণ করতে এবং বর্তমানকালে এই ঐশবাণী ঘোষণার উপায় বা পদ্ধতি একসঙ্গে খুঁজে বের করতে। নির্ধারিত এই সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা চিহ্নিত করব –

ক) ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতাসমূহ

খ) বর্তমানকালের এই বাস্তবতাগুলোর নিরিখে ঐশবাণী প্রচারের গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জসমূহ;

গ) এই গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ঐশবাণী প্রচারের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উপায়।

খুলনা ধর্মপ্রদেশে পরিপ্রেক্ষিতে –

(ক) সাধারণ দৃষ্টিতে কতগুলো বাস্তবতা

(১) *রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ঃ* গোটা বাংলাদেশের মত খুলনা ধর্মপ্রদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টানদের বাস।

(২) ***ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঃ*** খুলনা ধর্মপ্রদেশে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে বসবাসরত জাতিসমূহের বৈচিত্র যারা সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের অধিকারী। ধর্মপ্রদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে খ্রীষ্টান জনগণের মধ্যে আছে বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ইসলামিক ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি; ইসলাম, সনাতন ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় বিশ্বাস; খ্রীষ্টানদের মাঝে আছে বিভিন্ন অকাথলিক মণ্ডলী যেমন, চার্চ অব বাংলাদেশ, লুথেরান, ব্যাপ্টিষ্ট…।

(৩) ***অর্থনৈতিক ঃ*** অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ধর্মপ্রদেশের খ্রীষ্টভক্তগণ বেশীরভাগই দরিদ্র, ভূমিহীন, দিনমজুর। অনেকে কাজের সন্ধানে অনেক দূরে চলে যায়; অনেকে বিভিন্ন ব্যবসায় নামে; অনেকে শহরে ছোটে বা দেশের বাইরে যায় চাকুরীর সন্ধানে। ফাদার-সিস্টারদের কাছে ছুটে যায় অভাব অনটনে অসহায় হয়ে। দারিদ্র্যের কারণে অতিমাত্রায় পরনির্ভশীলতা।

(খ) বিশেষ দৃষ্টিতে কতগুলো বাস্তবতা

দৃষ্টি-১ : সবগুলো ধর্মপল্লী – জনগণ, ধর্মগুরু ও সমাজনেতাগণ

(১) মিশনারীদের সাহসী ভূমিকা (জেভেরিয়ান, পিমে, জেসুইট..) । বাণী প্রচার ও দারিদ্র্য নিরসনকল্পে সামাজিক উন্নয়ন। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার দিকে মনোযোগ। খ্রীষ্টধর্ম এখনো স্থানীয়করণ হতে পারেনি। সবাই মনে করে বিদেশী। প্রকৃত যীশুর মুখায়ব ফুটে উঠছে না। প্রত্যক্ষ প্রচারে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

(২) ধর্মপ্রদেশের কাথলিক জনগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস গ্রহণের বয়স অনেক, এদের অনেকেরই বোধ হয় ইসলামি পটভূমি রয়েছে। আবার অনেকেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে এতো প্রৌঢ় নয়। সনাতন ধর্মের পটভূমি যে আছে, তা হয়তো কীর্তনগুলোর দ্বারাই প্রকাশ পায়। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র; এরা খেটে খাওয়া মানুষ। পরিশ্রম না করলে এরা হাঁটতে পারে না; তাই যেকোন মানের ব্যবসার আশ্রয় নেয় বেঁচে থাকার জন্য। প্রকৃত বাঙ্গালী বলে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। তবে পেশার খাতিরে এলকাবিশেষ রিষি নামে পরিচিত। তারা হস্তশিল্পে পারদর্শী। গ্রামগুলো পাশাপাশি তাই স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয়তার বন্ধন বিরাজ করে। "শুদ্ধ বাংলা" বলে খুলনার জনগণ। খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে এই সার্বজনীন ভাব, মনোভাব, আচরণ, শব্দ চয়ন, সম্পর্ক থাকলে বাইবেল ভিত্তিক এক অপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ। গভীরে দেখলে, দেখা যাবে বিশ্বাস ও কৃষ্টির দিক দিয়ে এই খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে অনেক মূল্যবোধ রয়েছে; শুধু স্বীকৃতি দেবার মন-মানসিকতা থাকা চাই।

(৩) উল্লেখ করার মত কতগুলো ইতিবাচক বাস্তবতা রয়েছে অনেক। এখানে মানুষের মাঝে শান্তি সম্প্রীতির মাঝে বসবাস করার ঐতিহ্য রয়েছে। খুলনায় জনগণ তাদের মাঝে প্রচলিত কিছু কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে; যেমন, নীরবতাপ্রিয়তা ও ধ্যানময়তা, অনাড়ম্বর ও সাদামাঠা জীবনযাপন, শান্তি ও মিলন, অনাসক্ততা, অহিংসতা, কঠিন পরিশ্রমের মনোভাব, নিয়ম-শৃঙ্খলা। আরো আছে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, ধার্মিকতা ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। গুরুভক্তি, মণ্ডলীর পরিচালকদের উপর আস্থা; সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অনেকের মধ্যেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উদার মনোভাব। জনগণের অনেকেই প্রগতিশীল মনোভাবের, বিশ্বাসের শিকড়কে আরো গভীর করতে সদা আগ্রহী। অনেকেই মণ্ডলীর সেবাকাজে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন; একাজে সক্রিয় অংশ নিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়।

(৪) ঐশবাণী ও সংস্কারীয় জীবন

শুধু অন্য ধর্মের ভাইবোনদের মধ্যেই কাথলিক খ্রীষ্টভক্তদের বসবাস নয়, বহু অকাথলিক মণ্ডলীর মানুষের মাঝে কাথলিকদের বাস। জনগণ "বড়সভা"র দিকে অনেক আকৃষ্ট; আবার অনেকেই পবিত্র সংস্কার তথা খ্রীষ্টযাগ, পাপস্বীকারের দিকে বেশী আগ্রহী। বিশ্বাসী জনগণ দ্বারাই বাণীর সংস্কারীয় প্রকাশ হয়ে আসছে সেই আদি মণ্ডলী থেকেই।

(৫) বর্তমান যুগলক্ষণ অনুযায়ী

শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে প্রখর দূরদর্শী। নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী, বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজ পরিচালনায় তৎপর; যুগের সাথে তাল মেলাতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালায়। কৃষি পেশায় জড়িত, ঢাকা ও বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে চাকুরীরত। জীবনধারণের মান উন্নত করতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়। ধর্মীয় অনুশীলন, পারিবারিক প্রার্থনার ঐতিহ্য, বিভিন্নসংঘ সমিতি যেমন মারীয়ার সেনা-সংঘ, ভিনসেন্ট ডি পল ইত্যাদি। আর্থিক উন্নয়নে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত। অখ্রীষ্টান ভাইবোনদের সাথে মিলে-মিশে চলে। এই মানুষগুলো কি ইসলাম সমাজ থেকে আগত ? উৎসবকে উৎসব হিসেবেই উদ্‌যাপন করা; সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া, অতিথি নিমন্ত্রণ... অতি সহজে অন্যের সাথে মেলামেশা, যথেষ্ট বহির্মুখী, তাই অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান সবাই। মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য, গুরুভক্তি, ধর্মপল্লীতে সহযোগিতা, নানাবিধ শিল্পকলায় দক্ষ হওয়ার দিকে শত প্রচেষ্টা। বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা, ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ। এভাবে যুগের তালে ইতিবাচক ভাবে সামনে এগিয়ে যাবার প্রবল প্রচেষ্টা।

দৃষ্টি-২ : গতানুগতিক এবং আধুনিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ ঃ কঠিন তবে অসম্ভব নয়

বর্তমানে বহুবিধ বাস্তবতার ধাক্কায় অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। অধিক মাত্রায় স্বাধীনতার ফলে যুবগোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায় বৈরী ভাব, অনৈতিক আচরণ ... মানুষ আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে নিজের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে; অনৈতিক পথ অবলম্বন করছে অনেকেই অনেক কিছুতেই।

(১) পরিবারে খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান সবার অবাধ আসা-যাওয়া; অখ্রীষ্টানদের সাথে অহেতুক মাত্রারিক্ত মেলামেশা। বিভিন্ন কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। চাকুরীর দায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব; অনেক সময় অবিশ্বস্ততা। স্বামীবিহীন পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা; সন্তান যথেষ্ট যত্ন পায় না; বেড়ে ওঠে বিকৃত মন-মানসিকতায়। অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন, জীবন সহভাগিতা, পারিবারিক প্রার্থনা, এমন মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও আছে ভোগবাদ, বস্তুবাদ, আকাশ সংস্কৃতি...। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজনেতাদের মধ্যে গ্রাম্য-রাজনীতি, পক্ষপাতিত্ব, এমন কি দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তির অপব্যবহার। শেষে মাদকাশক্তিও একটা বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে বৈকি ! অনেক যুবক-যুবতী আজ বেকারত্বে ভুগছে। বিশ্বায়নের সুফল যেমন, হাজারও কুফল রয়েছে তেমন।

(২) পারিবারিক প্রার্থনা, ঐশবাণী নিয়ে ধ্যান, মণ্ডলীর শিক্ষা, পবিত্র শাস্ত্র বিষয়ে প্রকৃত ও মৌলিক ধারণা, নৈতিকতা, বিবেকের গঠন, পাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা, শিশু ও যুব গঠন – এমন বিষয়গুলোকে চাঙ্গা করে

তুলতেই হবে।

(৩) বিশ্বাস গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নেই বলেই হয়তো বিশ্বাস প্রকাশের দিকে এখনো গভীরতার অনেক প্রয়োজন আছে। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে চলে বাংলাদেশের সব খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাই। আর দারিদ্র্য মানুষকে স্বাবলম্বী হতে ভীষণভাবে বাধা দেয়; দেবার মধ্যে যে আনন্দ এই বাইবেলীয় সত্যটি (শিষ্যচরিত ২০:৩৫) পদে পদে হোঁচট খায়। দারিদ্র্যের কারণেই হয়তো আমাদের জনগণ "দেওয়ার মণ্ডলী", "পরিপক্ব মণ্ডলী" হয়ে উঠতে পারছে না। যাদের আছে জ্ঞান, অর্থ, বিত্ত, সংসারে প্রগতি, তারা অন্যের সাথে সহভাগিতা করতে এবং অন্যেরাও বেড়ে উঠুক এমন পথ বাস্তবে অবলম্বন করলে সত্যিই তো সমাজ "ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ" সক্রিয়া হয়ে উঠবে। বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

(৪) বিশ্বাস গ্রহণের দিক থেকে প্রৌঢ় বা যুবা/কিশোর, পেশা যা-ই হোক, বাণীর গভীরে যাওয়া, বাণীধ্যান করা এবং বাণীর শিক্ষা জীবনে, সমাজে, পারিবারিক, যাজকীয়, ব্রতীয়, খ্রীষ্টভক্তির জীবনে প্রকাশ... এগুলো প্রয়োজন সবারই।

(৫) বিশ্বাস গ্রহণের দিকে থেকে প্রৌঢ় বা যুবা/কিশোর, পেশা যা-ই হোক, সীমিত বা সংকীর্ণ পরিধি পেরিয়ে সাধু লুকের মতো, মাদার তেরেজার মতো, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মতো, সর্বপরি সবার বন্ধু ও ত্রাতা যীশুর মতো হতে হয় সার্বজনীন যেখানে থাকবে পারস্পরিক ভালবাসা ও গ্রহণ। আর নম্রতা ছাড়া প্রেম হয় না; নম্রতা ছাড়া 'পা ধোয়ানো' পূর্ণ হয় না।

অতএব বিশ্বাস গ্রহণের দিক থেকে প্রৌঢ় বা যুবা/কিশোর, সবাইকে নিয়ে আজ প্রথম ক্ষেত্র বাণী প্রচার, যীশুর গল্প বলা। যীশুর মূল্যবোধে জীবন নবায়ন ক'রে নিজ জীবনকে বাণীরূপে একটি প্রচার করে তোলা। হতেও তো পারে ঃ মাটি প্রথম দিকে উর্বরই ছিল; কান প্রথম দিকে উন্মুক্তই ছিল। ধীরে ধীরে সূর্যের খরতাপে, আরো হরেক রকমের উত্তাপে মাটি বরেন্দ্রভূমির মত শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে। জলের অপেক্ষায় আছে।

বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজের কাছে বাণী প্রচার, যীশুর গল্প বলা আজ সত্যই অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। এদের নেতিবাচক বাস্তবতার কুফল থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার যীশুর মূল্যবোধে জীবন গড়তেই হবে।

সার্বিকভাবে বাণী প্রচারের ক্ষেত্র খুলনা ধর্মপ্রদেশ

১। আমার ব্যক্তি জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে
২। শিশু, কিশোর, যুবা; নারী, পুরুষ ভক্ত সমাজ
৩। যাজক সমাজ ও সন্ন্যাসব্রতী সমাজ
৪। প্রতিষ্ঠানে, গঠন গৃহে, সংস্থা-সংগঠনে
৫। উপাসনায় : ঐশবাণী পাঠ ও অনুধ্যান, প্রার্থনায়, গানে

এরপর–

❑ অন্যান্য মণ্ডলী, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী; ❑ যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে আগ্রহী

উপায় বা পদ্ধতি

এ পরিস্থিতিতে হয়তো গতানুগতিক ধারায় বাণী ঘোষণা তথা যীশুর গল্প বলা স্থায়ী মূল্য না-ও দিতে পারে। যুগোপযুগী পদ্ধতি কি হতে পারে? খুঁজতে হবে বর্তমান যুগ লক্ষণ, দাবী ও চ্যালেঞ্জগুলোর আলোকে এমন খ্রীষ্টানদের মাঝে বাণী প্রচার বা যীশুর গল্প বলার উপায় বা পদ্ধতি।

নব প্রেরণা : মঙ্গলবাণীর পথযাত্রায় আমাদের নবপ্রেরণার মূল উৎস হচ্ছে, আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি। সকল প্রকার বাস্তবতায় ঈশ্বর পিতা ও মাতা, পালন ও রক্ষাকর্তা, মুক্তিদাতা ও জীবনস্বামীরূপে আমাদের মাঝে (খুলনা ধর্মপ্রদেশে) উপস্থিত আছেন। সকল বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের মধ্যেও তিনি নতুন সৃষ্টির কাজে নিরত রয়েছেন।

এই ঈশ্বরোপলব্ধি অতীতকে নতুন জ্ঞান দিয়ে গঠনমূলক মূল্যায়ন করতে এবং বর্তমান অবস্থাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করতে সাহায্য করবে এবং নতুন পদ্ধতি বের করতে অনুপ্রাণিত করবে।

নতুন পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতির মধ্যে থাকবে নতুন ধ্যান-ধারণা যা নিজের ও অন্যের কাছে সহজে বোধগম্য ও গৃহীত, স্বীকৃত। এই নতুন পদ্ধতির মূল কথাই হচ্ছে : ঈশ্বরের মুখচ্ছবিকে নতুন করে দেখা।

নতুন প্রকাশ : মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবন যাপনের নতুন উপায় ও পন্থা, যা দ্বারা বাস্তব জীবনে

ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ পাবে (যেমন ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় মিলন-সমাজ, ইত্যাদি)।

সবশেষে

১। যারা মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে, যীশুর বিষয় শুনতে আগ্রহী তাদের মাঝে যীশুর গল্প নিয়ে তথা ঈশ্বরের বাণী হাজির হওয়া, ঈশ্বরের বাণী নিয়ে হাজির হওয়া।

২। অল্প হলেও আছে, জীবন খ্রীষ্টবিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের পালকীয় যত্ন নেওয়া; তাদের চলমান গঠন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যীশুর গল্পগুলো যেন আরো অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে পারে এবং অন্যদের কাছে বলতে পারে।

৩। আরো একদল আছে, যাদের জীবনে বিশ্বাসের গভীরতা নেই; অনেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এদের অনেকে আছে নিজেদের মণ্ডলীর সদস্য বলে পরিচয় দেয়, তবে মণ্ডলীর সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বা সঠিক নয়। এদের মাঝে নতুন করে যীশুর গল্প বলা শুরু করতে হবে (কেরিগ্‌মা)। যীশুর জীবন কাহিনী তুলে ধরতে হবে।

৪। এই যীশুর গল্প বলা, বাণী প্রচারের ধরণ, পদ্ধতি, কৌশল অবশ্যই হতে হবে সংস্কৃত্যায়নের মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত্যায়নের মধ্যে গেলেই যীশুর গল্প হয়ে উঠবে গ্রহীতার কাছে হৃদয়গ্রাহী, বোধগম্য।

৫। অন্য ধর্মের বিষয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার সময় এসেই গেছে। তাদের কাছেও তো তাঁর গল্প বলতে হবে। কথা দিয়ে, বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় আচরণ দিয়ে।

৬। কাথলিক মণ্ডলী ও প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোর স্বরূপ, সংলাপযোগ্য বিষয় ও ক্ষেত্র এবং অ-সংলাপযোগ্য বিষয়/অবস্থান, কাথলিক মণ্ডলীর চিন্তাধারায়, ঐশতত্ত্বে পবিত্র শাস্ত্র ও ঐতিহ্য বা প্রেরিতিক পরম্পরা এবং কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা – এগুলোর উপর সুস্পষ্ট ধারণা।

নিজের না থাকলে, নিজে না জানলে যে অন্যকে দিতে বা অন্যকে জানাতে পারা যায় না। তাই যীশুকে জানা, ***Jesus story*** *জানা একান্তই জরুরী। নতুবা ঝুঁকি : নিজেই যীশুর বিষয় উল্টা-পাল্টা ধারণা রাখব, জীবন হবে যীশুর মূল্যবোধের পরিপন্থী। আর যদি প্রকৃতই সাধনা করে যীশুর গল্প জানি, তাঁকে প্রতিদিন ধ্যান-জ্ঞান-আচরণে অভিজ্ঞতা করি; জীবন দিয়ে প্রকাশ করি তবেই আমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়বে, আমরা যীশুর গল্প বললে তা বিশ্বাস করবে; বলতে পারি কথায়, ব্যবহারে, সুসম্পর্কে, কাজে, মনোভাবে...। আমাদের এই বলার ফলপ্রসূতা হবে : রূপান্তর আমাদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে; যার বা যাদের কাছে যে-পদ্ধতিই বলছি, তার বা তাদের জীবনে দেখা দেবে এই পরিবর্তন। তবে হ্যাঁ, এই গল্প-বলা ও রূপান্তরকে চলমান করে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তবে অসম্ভব নয়। আর এজন্যেই তো এবারের এই পালকীয় সম্মিলনী, যেন সম্মিলনী শেষে শিষ্যদের মতই উদ্যম ও সাহস নিয়ে বলতে পারি : "আমরা যা শুনেছি, নিজেদের চোখেই যা দেখেছি, দু' চোখ ভরেই দেখেছি, আমাদের হাত যা স্পর্শ করেছে, সেই জীবন স্বরূপ স্বয়ং বাণীর কথা-ই এখন বলছি" (যোহন ১:১)।*

– ফা: প্যাট্রিক গমেজ
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, মার্চ ২৭, ২০০৮

বক্তব্যের উপর মুক্ত আলোচনা

বাণী প্রচারের ক্ষেত্র হল মানুষ। হৃদয় থেকে বাণী প্রচারের ইচ্ছা জাগতে হবে। বাণী প্রচারের পদ্ধতি আমাদের জানতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ছাড়াও আমরা অন্য কি ভাবে বাণী প্রচার করতে পারি — কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে বাণীকে উপস্থাপন করতে হবে। বাণী প্রচার ও আমাদের জীবন যাপনে মিল না থাকলে, যাদের কাছে প্রচার করব, তা তাদের স্পর্শ করবে না। আমাদের জীবন সাক্ষ্য দিয়ে বাণী প্রচার করতে হবে।